বিপ্লবের প্রতীক
শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

জীবন মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

সর্বমঙ্গলা সারদার অবস্থান সর্বজনীন এবং সর্বব্যাপী মাতৃত্বে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ কখনই তাঁর কাছে কোনো বাধা হয়ে ওঠে নি। যার কেউ নেই, কিছু নেই সেও তাঁর কাছে আশ্রয় ও প্রশ্রয় পেয়েছে। সর্বভূতে তিনি আছেন 'মা'-রূপে, সর্বভূতে তিনি আছেন আত্মা-রূপে। 'জননী' এবং 'দেবত্ব' বা আত্মা—দুটি রূপেই তিনি অপ্রতিরোধ্য শক্তিরূপে আমাদের সমাজকে আলোড়িত করেছেন। এই আলোড়নই অনেকের কাছে বিপ্লব বলে মনে হয়েছে। পৃথিবী এমনটি আগে কখনও দেখে নি।

শ্রীমা নানা দিক থেকে নতুন চিন্তার দিশারী। স্কুল-কলেজে লেখাপড়া না করেও সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি নবীন চিন্তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এ কারণে তিনি অনায়াসে বলতে পারেন যে, বৈধব্য জীবনে কঠোরতার কোন প্রয়োজন নেই বা একাদশীতে খাদ্যগ্রহণ নিষিদ্ধ নয়। তিনি ঠুনকো শুচিবাইয়ের বিরোধিতা করছেন, বলছেন বেশি জপ-ধ্যানের দরকার নেই, শুধু জপধ্যান নয়—কাজ চাই। আবার তিনি ইচ্ছামতো দীক্ষা ও সন্ন্যাস দিচ্ছেন। জাতপাতের গণ্ডি ভেঙে আচণ্ডাল সকলকে তিনি কাছে টেনে নিচ্ছেন। অভিনেতা-অভিনেত্রী, পতিতা, গরিব, মুসলিম, খ্রিস্টান, চোর ডাকাত—কেউ তাঁর পর নয়। স্বামী সারদানন্দ এবং দস্যু আমজাদ তাঁর কাছে সমান। এই রক্ষণশীল গ্রামীণ পরিবেশে মানুষ হয়েও তথাকথিত 'হীনবর্ণের' মানুষদের এঁটো কুড়োতেও তাঁর বাধে না। গ্রামের তথাকথিত 'ছোটজাতের' মানুষদের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক। তিনি কারো দিদি, বোন, পিসি এবং মা। নিজে শিক্ষিতা না হয়েও মা শিক্ষাবিস্তার, নারীশিক্ষা, ইংরেজি শিক্ষা ও নার্সিং শিক্ষার সমর্থক এবং বাল্যবিবাহের বিরোধী। বর্তমান গ্রন্থকার শ্রীমাকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে এগুলির মধ্যেই মায়ের বিপ্লবী চেতনা লক্ষ করেছেন।

গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু একেবারে নতুন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক একটি সম্পূর্ণ অনালোচিত বিষয়। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবীরা দলে দলে মায়ের কাছে আসছেন, মা তাঁদের দীক্ষা দিচ্ছেন, তাঁদের ওপর সরকারী অত্যাচারের সংবাদ

শুনে চোখের জল ফেলছেন, বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বাঘা যতীন মায়ের কাছে যাচ্ছেন—এ সব বহু নতুন কথা এখানে আলোচিত হয়েছে।

অধ্যাপক শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ে আমার সহপাঠী। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখে ছাত্রমহলে এবং বিশেষ করে অধ্যক্ষ স্বামী মুমুক্ষানন্দজীর ছায়াপথে পড়েন। এখন তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ও গ্রন্থকার। বর্তমান বইটি পূর্ববর্তী রচনার পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ। আশা করি বইটি আগের মতোই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এবং মায়ের চিন্তা ও চেতনা উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে। জয় মা!

স্বামী সুপর্ণানন্দ
অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়
নরেন্দ্রপুর

দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য

স্বামী উমানন্দ-রচিত প্রস্তাবনা

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর যুগ-প্রয়োজনে আবির্ভাব-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অষ্টমাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজি মহারাজের উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ শেষ, এখন শ্রীশ্রীমায়ের যুগ শুরু।

বিশ্বব্যাপ্ত মাতৃভাবের দুকূলপ্লাবী-প্রবাহে, মানব সমাজে অশুভ শক্তির বিনাশ ও শুভবুদ্ধি পুনরুদ্বোধনের প্রয়াসে, এবার জগজ্জননী সারদাদেবী একাধারে 'বগলা' ও 'সরস্বতী' রূপে মর্তে আবির্ভূতা। বহু বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে-দীপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের জীবনালেখ্য থেকে এ-প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা অনুসন্ধিৎসু-মনে সাড়া জাগাবে। সহজেই স্মরণ-পথে আসবে—অপ্রকৃতিস্থ 'হরিশ'-কে কঠোর শাস্তিদান। একাদিক্রমে স্বাধীনতা সংগ্রামে নির্যাতিতা সিন্ধুবালা-র জন্য মায়ের অগ্নিময়ী-মূর্তি, শ্রীঅরবিন্দ-কে 'বীর-সন্তান' আখ্যায় ভূষিত করা, 'বাঘা-যতীন'-কে ট্রেনের কামরায় আশীর্বাদ-দান, বিদেশিনি মার্গারেট-কে 'খুকি' বলে সাদরে গ্রহণ, লর্ড কারমাইকেল-এর বিরূপ মনোভাব ও রাজরোষ থেকে মঠ ও মিশনের রক্ষাকর্ত্রী-রূপে দৃঢ় ও বিচক্ষণ পদক্ষেপ, বিশ্বব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের 'সঙ্ঘ-জননী'-র গুরুদায়িত্ব পালন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসন-এর ১৪-দফা শান্তি-প্রস্তাব সম্বন্ধে মায়ের বাস্তব মন্তব্য ঃ 'ওরা যা বলে, সব মুখস্থ, অন্তস্থ নয়', শিক্ষা প্রসঙ্গে ঃ নিজের শিক্ষা, গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা, জয়রামবাটীতে স্কুল ও দাতব্য-চিকিৎসালয় গঠন, ধাত্রী-বিদ্যা, শিল্প-শিক্ষা, 'নিবেদিতা-বালিকা-বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা ও গৌরী-মা'র 'সারদেশ্বরী আশ্রম'-এর মেয়েদের সর্বদা উৎসাহ, উপদেশ ও আশীর্বাদ-দান, বিশ্বমাতৃত্বের চরম পরাকাষ্ঠা- রূপে মায়ের উক্তি ঃ 'শরৎ আমার যেমন ছেলে, আমজাদ-ও তেমনি ছেলে', বিনোদিনী, তিনকড়ি ও তারাসুন্দরী-র মতো সমাজ-নিন্দিতা, পতিতা-নারীদের কন্যা-রূপে গ্রহণ, আশীর্বাদ ও অভয়-আশ্রয় দান, তিনি 'সতেরও মা, অসতেরও মা, অসতীরও মা', 'অদ্বৈত-জ্ঞান আঁচলে বেঁধে' জীবন-চর্যার আদর্শ ঃ 'সাধনা করতে করতে বুঝতে পারবে—আমার ভিতর যিনি, তোমার ভিতরেও তিনি, দুলে-বাগদির ভিতরেও তিনি', অশান্ত-জগতের প্রতি তাঁর শঙ্খরোল—'যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখো না, জগতে কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।'

এ বছর (ডিসেম্বর, ২০০৩-২০০৪), সমগ্র বিশ্বে অভূতপূর্ব উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধ-শততম আবির্ভাব-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

এই 'ঐতিহাসিক' লগ্নে, জগন্মাতার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত হল আমাদের ভক্তি-বিনম্র অর্ঘ্য—বিচিত্ররূপিণী শ্রীশ্রীমায়ের অনন্যসাধারণ জীবনের এক স্বল্পালোচিত কিন্তু অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক-অবলম্বনে, কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের মনস্বী-অধ্যাপক শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায়-রচিত গ্রন্থের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত- সংস্করণের নব-কলেবরে প্রকাশ ঃ 'শ্রীশ্রীমা—বগলার অবতার।'

১৫০ বছর আগে মায়ের আবির্ভাব-লগ্নে ভারত-সংস্কৃতি ক্ষীণধারায় প্রবাহিত ছিল। এই দেড়শ' বছরের মধ্যে জাতির জীবনে এসেছে অভূতপূর্ব প্লাবন। কবির একটি গানের কলি সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়—

'এবার তোর মার গাঙে বান এসেছে,
'জয় মা'-বলে ভাসা তরী।'

মাতৃ-মহিমার নব-নব বিকাশে, ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতি-ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান-আধ্যাত্মিকতার শুষ্ক-সাগরে প্রবাহিত হল নববর্ষার উচ্ছ্বসিত প্রবল জলস্রোত, অভাবিত উর্বরতায় সঞ্জীবিত হল ভারতের প্রাণশক্তি। রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ-যুগে উত্তরণ, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভাধর পুরুষদের আত্মপ্রকাশে, সরস্বতী-রূপা সারদার আবির্ভাবের দ্যোতনা আভাসিত হল— শ্রীরামকৃষ্ণেরই কথা ঃ 'ও সারদা, সরস্বতী। — ও কি যে সে! ও আমার শক্তি।' সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা হল আমাদের ঊষর মনোভূমি, নব-চেতনার উদ্ভাসে 'ঘুমের দানব' ("Sleeping Leviathan") শত শতাব্দীর তন্দ্রাজাল বিদীর্ণ করে জেগে উঠলো শাশ্বত-আলোকের রাজ্যে।

গ্রন্থটি পাঠক ও ভক্ত-হৃদয়ে আনন্দ ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার করুক—এই পুণ্যমুহূর্তে বিশ্বজননীর শ্রীচরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

১২ জানুয়ারি, ২০০৮

স্বামী উমানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ
বিবেকানন্দনগর
পুরুলিয়া

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

অত্যন্ত আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে যতটা পরিচিত, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে ততটা ওয়াকিবহাল নন। তাঁদের ঘরে মা সারদা দেবীর ছবি টাঙানো থাকলেও, তাঁদের ধারণা যে, তিনি সম্পূর্ণভাবে ধর্ম-জগতের মানুষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী জনৈক প্রবীণ বিপ্লবীর মুখে শ্রীমা সম্পর্কে এমন কথাও শুনেছি যে, তিনি হলেন "অশিক্ষিতা মুখ্যু এক মহিলা। মিশনের সাধুরাই তাঁকে বড়ো করে তুলেছেন।" এরই পাশাপাশি আবার প্রবল ক্ষমতাবান এবং জীবনে পূর্ণ সফল এমন প্রবীণ মানুষও দেখেছি, মায়ের কথা বলতে গেলে যিনি ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে পড়েন। তাঁর কাছে, মা 'দেবী ঈশ্বরী।'

বর্তমান গ্রন্থে আমি কোনো দেবী বা ঈশ্বরীর কথা বলিনি—বরং সেই 'অশিক্ষিতা মুখ্যু মহিলার' কথাই বলার চেষ্টা করেছি, যিনি শতবর্ষ পূর্বে বাংলার বুকে বিস্ময়কর পণ্ডিতের মতো কাজ করে গেছেন। সম্পূর্ণভাবে 'মুখ্যু' হয়েও, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের এই বিধবা পত্নী সেদিন সধবার বেশ পরিধান করতেন, একাদশীতে খেতেন, জাতপাত মানতেন না, চরিত্রহীন, মদ্যপ, পতিতা, বিধর্মী ও বিদেশিদের সঙ্গে একত্রে বসবাস ও আহার করতেন। রঙ্গালয়ের ঘৃণ্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বুকে টেনে নিতেন, জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে সন্ন্যাস ও দীক্ষা দিতেন এবং নিজে গুরু হয়েও গুরুবাদ ও অলৌকিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন। তিনি ছিলেন নারী জাগরণের অন্যতম পুরোধা, নারী-শিক্ষার সমর্থক, আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষা ও জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী এবং বাল্যবিবাহ-বিরোধী। বহুক্ষেত্রে রামমোহন, কেশব সেন, বিদ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীদের গৌরবও তাঁর কাছে ম্লান হয়ে যায়। শুনলে আশ্চর্য লাগে যে, সামাজিক-অনাচারের দায়ে জমিদারের কাছে তাঁকে অর্থদণ্ডও দিতে হয়। 'অশিক্ষিতা মুখ্যু' এই মহিলা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেরও একজন সমর্থক ছিলেন। 'বন্দেমাতরম' কণ্ঠে নিয়ে হল্লাবাজির পরিবর্তে তিনি গঠনমূলক কর্ম চেয়েছিলেন। তাঁর বাসস্থানের ওপর পুলিশের কড়া নজর ছিল। বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ ঘোষ, বাঘা যতীন, দেবব্রত বসু, মাখনলাল সেন, শচীন সেন, সুধীরা দেবী, নিবেদিতা প্রমুখ বহু বিপ্লবী ছিলেন তাঁর স্নেহের পাত্র-পাত্রী। বিপ্লবী সন্তানদের জন্য তাঁর চিন্তার শেষ ছিল না—তাঁদের জন্য তিনি নীরবে চোখের জল ফেলতেন। শতবর্ষ পূর্বের সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমা নিশ্চয়ই বিপ্লবী এবং নারী জাগরণের অন্যতম পুরোধা।

শ্রীমা সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থাদি ও নানা পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা এর সবই জানেন—এখানে নতুন হল কেবলমাত্র ঘটনাবিন্যাস, ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিভঙ্গিটুকুই। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বহুলাংশে অজ্ঞাত। মায়ের চিন্তাধারার সম্পূর্ণ একটি নতুন দিক এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। স্বামী গম্ভীরানন্দ ও ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য রচিত মায়ের জীবনী এবং 'উদ্বোধন' প্রকাশিত 'মায়ের কথা' থেকে সংগৃহীত তথ্য পৃথকভাবে উল্লেখ করিনি, কারণ এই কালজয়ী গ্রন্থগুলি ব্যতীত 'মা' সম্পর্কে কিছু লেখা অসম্ভব।

গ্রন্থ-রচনার কালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী ও আমার সহপাঠী স্বামী সুপর্ণানন্দ (বর্তমান অধ্যক্ষ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়) এবং সতীর্থ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (অধ্যক্ষ, আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশন) নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। তবে গ্রন্থে প্রকাশিত সিদ্ধান্তগুলি আমার—এর সঙ্গে তাঁদের মতামতের কোনো সম্পর্ক নেই।

গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে শ্রীঅভয়কুমার ঘোষ এবং শ্রীগোবিন্দ রায়মৌলিকের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

দেবী বা ঈশ্বরী নন—'অশিক্ষিতা মুখ্যু' এই মহিলার চিন্তাধারার এই বিশেষ দিকগুলি সম্পর্কে উন্নাসিক পণ্ডিতরা জ্ঞাত হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

জীবন মুখোপাধ্যায়

ইতিহাস বিভাগ,
বিদ্যাসাগর কলেজ, কলকাতা-৬
২০. ০৬. ৮৫

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় ঃ শ্রীশ্রীমা ঃ এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব	১৭-২১
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ব্যক্তি-স্বাধীনতার পূজারি শ্রীশ্রীমা	২২-৩১
নারী 'নরকের দ্বার' নয় ২২; ও হরিকথা কয় ২২; তুমি তো সবার ঠাকুর ২৩; এভাবে গালাগালি করা কেন ২৩; ওদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব ২৩; রামলাল, তোর খুড়িকে শান্ত কর ২৪; আত্মমর্যাদাবোধ ২৪; পরঘোরো ভাল নয় ২৪; কাজ তো চলে যাচ্ছে ২৪; গিরিশচন্দ্র ও সন্ন্যাস ২৫; মঠে বলি নিষিদ্ধ ২৫; তোমার ওসব বিক্রি করার অধিকারই বা কোথায় ২৫; তোমরাও অদ্বৈতবাদী ২৬; একে মঠে ফিরিয়ে নিয়ে যাও ২৬; সন্ন্যাসীর চাকর। আবার সে চাকরকে মার ২৬; হাইকোর্টে নালিশ করতে গিয়েছিলি ২৬; ব্রতভঙ্গকারীর সন্ন্যাসী-সঙ্ঘে স্থান নেই ২৭; সেবা কাজ ঠাকুরের ভাবানুগ ২৭; রাজরোষে নিয়ম লঙ্ঘন অধর্ম ২৭; অন্যের স্বাধীন সত্তায় হাত নয় ২৮; তোমাদের কথামত চলতে পারব না ২৮; শরৎ কি বলবে ২৮; বেশি বকলে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় ২৯; বউটাকে মেরে ফেলবি নাকি ২৯; পরের দাসত্ব করা নয় ৩০; নারী অবলা নয় ৩০।	
তৃতীয় অধ্যায় ঃ ধর্ম-সংস্কারক শ্রীশ্রীমা	৩২-৬০
✪ **বিধবাদের সম্পর্কে** ৩৩; সধবার বেশ ৩৩; বিধবার নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ ৩৪; মায়ের মাংস রান্না ৩৫; একাদশীতে খাদ্যগ্রহণ নিষিদ্ধ নয় ৩৫; বৈধব্য জীবনে কঠোরতার দরকার নেই ৩৬; শ্রীমা ও মাছ-মাংস ভক্ষণ ৩৬।	
✪ **ঠুনকো শুচিবাইয়ের বিরোধিতা** ৩৭; দীক্ষাদানের বিচিত্র-পদ্ধতি ৩৮; বিচিত্র-সন্ন্যাস ৪২; বেশি জপধ্যান অপ্রয়োজনীয় ৪২; কাজ চাই; শুধু ধ্যান-জপ নয় ৪৬; 'গাছতলার সাধু' দরকার নেই ৪৭।	
✪ **পূজা-পদ্ধতির দরকার নেই** ৪৮; এ কেমন পুজো? ৪৯; অব্রাহ্মণ স্ত্রীলোকের বিনা মন্ত্রে পুজো ৫০; স্ত্রীলোকের অশুচি অবস্থায় পুজো ৫১; পুজোয় শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার নেই ৫১; বিচিত্র হোম ৫২; খাওয়ার পর পুজো ৫২; পুজোর আগেই প্রসাদ ৫২; ঠাকুরের ভোগের বাটিতে অন্যকে খেতে দেওয়া ৫৩; বাড়িতে পুজো-আরতির দরকার নেই ৫৩।	

বিষয়	পৃষ্ঠা
✪ গুরুবাদওঅলৌকিকতারবিরুদ্ধেশ্রীশ্রীমা ৫৩; কৃচ্ছ্রসাধনের বিরুদ্ধে শ্রীশ্রীমা ৫৬; তোমরা মাছ খাবে ৫৭; আমার ছেলে মাংস খাবে না কেন? ৫৭; সমকালীন বিদগ্ধ-বাংলা ৫৮।	
চতুর্থ অধ্যায় ঃ সমাজ সংস্কারক শ্রীশ্রীমা	৬১-৯৮
✪ জাতপাতের ঊর্ধ্বে ৬১; ভক্তের আবার জাত কি ৬১; নানা জাতের এঁটো কুড়োনো ৬২; কে বলেছে, তুমি হীন জাত? ৬২; অব্রাহ্মণ ও শূদ্রের হাতে আহার ৬৩।	
✪ তথাকথিত নিম্নশ্রেণির মাঝে ৬৫; গ্রামের কৃষকদের মাঝে ৬৮; দরিদ্র ভক্তদের সঙ্গে ৭১; সমকালীন বিদগ্ধ সমাজ ৭২।	
✪ অব্রাহ্মণকে প্রণামের নির্দেশ ৭৩; ✪ মুসলমানভক্ত ৭৪; ✪ বিদেশি খ্রিস্টানদের মাঝে ৭৮; সমকালীন বিদগ্ধ সমাজ ৮০।	
✪ অন্যের ধর্ম ও দেবস্থান সম্পর্কে শ্রীশ্রীমা ৮০	
আমি সতেরও মা, অসতেরও মা ৮২; চরিত্রহীন পতিতার পাশে ৮২; অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাঝে ৮৫; সমকালীন বিদগ্ধ সমাজ ৮৬; গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৮৯; অমৃতলাল বসু ৯০; তারাসুন্দরী ও তিনকড়ি ৯২; নীরদাসুন্দরী ৯৩; সমকালীন বিদগ্ধ সমাজ ৯৩।	
✪ সমুদ্রযাত্রা, ম্লেচ্ছ-সংসর্গ ও শ্রীশ্রীমা ৯৪	
পঞ্চম অধ্যায় ঃ শ্রীশ্রীমা ও নারীমুক্তি	৯৯-১১৩
✪ মায়ের বিদ্যাচর্চা ৯৯; জয়রামবাটীতে শিক্ষার প্রসার ১০১; ভাইঝিদের লেখাপড়া ১০২; কোয়ালপাড়ায় স্ত্রীশিক্ষা ১০২; আধুনিক শিক্ষার সমর্থক শ্রীশ্রীমা ১০৩; নিবেদিতা বিদ্যালয় ১০৩; শিক্ষামূলকভ্রমণ ১০৪; সংবাদপত্রে ছবি ১০৪; গৌরী-মার বিদ্যালয় ১০৪; ইংরেজি শিক্ষার সমর্থক ১০৫; নার্সিং শিক্ষা ১০৫; সমকালীন বিদগ্ধ সমাজ ১০৬।	
✪ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে শ্রীশ্রীমা ১০৭; ✪ সমকালীন বিদগ্ধ সমাজ ১০৭।	
✪ নারীর ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসের অধিকার ১০৮;	
✪ শূদ্র ও নারীর সন্ন্যাস ১০৯।	
✪ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ১১০; ভগিনী সুধীরা ও গৌরী-মা ১১০।	
✪ নারী পূর্ণ-স্বাবলম্বী ১১১।	

বিষয়		পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ শ্রীশ্রীমায়ের আধুনিকতা ১১৪-১১৭

মায়ের ফটো-তোলা ১১৪ ; রঙ্গালয়ে শ্রীশ্রীমা ১১৫ ; সঙ্গীত, শিল্পকলা ও শ্রীশ্রীমা ১১৬ ; শ্রীশ্রীমা ও সংসার-ধর্ম ১১৬।

সপ্তম অধ্যায় ঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও শ্রীশ্রীমায়ের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ১১৮-১৬০

✪ **জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী** ১১৮ ; ইংরেজ শাসন সম্পর্কে শ্রীমা ১১৯ ; ইংরেজ শাসনের অবসান সম্পর্কে শ্রীমা ১২০।

✪ **স্বদেশি যুগ ও শ্রীমা** ১২১ ; 'হুজুগ নয়, কাজ করো' ১২১ ; ধর্মীয় আন্দোলন ১২২ ; স্বদেশি বস্ত্র ও আন্তর্জাতিকতাবোধ ১২৪।

✪ **বিপ্লবী বাংলা ও শ্রীশ্রীমা** ১২৬ ; শ্রীশ্রীমা-দেশপ্রেমিকদের আশ্রয় ১২৬ ; অরবিন্দ-পত্নী মৃণালিনী ১২৭ ; বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ ও শ্রীমা ১২৮ ; বিপ্লবী দেবব্রত বসু ও শচীন সেন প্রসঙ্গ ১৩০ ; ভগিনী সুধীরা ১৩৩।

✪ **শ্রীশ্রীমায়ের চরণতলে** ১৩৩ ; প্রফুল্লমুখী বসু ১৩৫ ; আরও কয়েকজন ১৩৫ ; ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ১৩৬ ; বাঘা যতীন ও শ্রীমা ১৩৬ ; সরকারের অত্যাচার সম্পর্কে শ্রীমা ১৩৮ ; বিপ্লবী যুগের পিসিমা ও শ্রীমা ১৩৮ ; বিপ্লবী দীনেশ দাশগুপ্ত ১৩৯ ; বিপ্লবী নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ১৩৯ ; বিপ্লবী গৌরহরি ভট্টাচার্য ১৩৯।

✪ **নির্যাতিত বিপ্লবীদের পাশে শ্রীশ্রীমা** ১৪০ ; 'এই ইংরেজদের রাজ্য কি থাকবে' ১৪০ ; স্বামী জ্ঞানানন্দ ১৪০ ; সুরেশ চৌধুরী ১৪০ ; 'এর একটা প্রতিকার শীঘ্র হবে' ১৪১ ; পুলিশের খাতায় শ্রীশ্রীমা ১৪১ ; দারোগার চাকরি করার জন্য মায়ের নির্দেশ ১৪২ ; শ্রীশ্রীমা বিপ্লববাদের সমর্থক ১৪২।

✪ **নিবেদিতার মঠত্যাগ-প্রসঙ্গ** ১৪৩ ; নিবেদিতা প্রসঙ্গে বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ ১৪৪ ; শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজি সম্পর্কে হেমচন্দ্র ঘোষ ১৪৫ ; শ্রীমা সম্পর্কে হেমচন্দ্র ১৪৬ ; বিপ্লবী মতিলাল রায় ১৪৭ ; ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় ১৪৭।

✪ **সিন্ধুবালা প্রসঙ্গ** ১৪৭।

✪ **রাজরোষে মিশন—মায়ের ভূমিকা** ১৫১।

✪ **রাজনৈতিক ডাকাতি ও শ্রীমা** ১৫১।

✪ **রাওলাট সত্যাগ্রহ ও শ্রীশ্রীমা** ১৫২।

প্রথম অধ্যায়

শ্রীশ্রীমা ঃ এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। ভারতীয় জাতীয় জীবন সেদিন নানা অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। ধর্মীয় ভেদাভেদ, জাতপাতের সমস্যা, পদে পদে নিষেধের বেড়াজাল এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ অক্টোপাসের কঠিন বন্ধনে দেশ সেদিন স্থবির হয়ে পড়েছে। বাল্যবিবাহ, পর্দাপ্রথা, নানাপ্রকার অশিক্ষা-কুশিক্ষা, সপত্নী-সমস্যা ও অকালবৈধব্য প্রভৃতি নানা সমস্যায় সেদিন জর্জরিত নারীসমাজ। রান্নাঘর এবং আঁতুড় ঘরের বাইরে যে কোনো জগৎ আছে, এ সম্পর্কে নারীদের কোনো ধারণাই ছিল না। পুরুষের চোখে তাঁরা ছিলেন 'বোঝা'-স্বরূপ এবং 'প্রজনন-যন্ত্র' -মাত্র। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, খ্রিস্টান মিশনারি সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন নারীহিতৈষীদের কার্যকলাপ সেদিন দেশে জাগরণের সৃষ্টি করলেও, প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অকিঞ্চিৎকর।

জাতীয় জীবনের এই পরিস্থিতিতে, বাংলার এক নিভৃত পল্লির বুকে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী। সাধারণ পল্লিবালিকাদের মতোই নিজ পরিজনবর্গের মধ্যে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হন। সে যুগের নিয়ম অনুসারে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ তিনি পাননি এবং বাল্যকালেই তাঁকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। সংসারের আর সাধারণ পাঁচজন নারীর মতোই তিনি 'অর্ধোন্মাদ' স্বামীর সেবা করেছেন, স্বহস্তে রান্নার আয়োজন করেছেন, 'সন্তান'-দের খেতে দিয়েছেন, এঁটো কুড়িয়েছেন, বাসন মেজেছেন, জ্যেষ্ঠা-ভগিনী হিসেবে ভাইদের সংসারে কর্তৃত্ব করেছেন এবং সাধারণ বিধবাদের মতো কন্যাজ্ঞানে পিতৃহারা ভাইঝিকে প্রতিপালন করেছেন। এ সবের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে আদর্শ-গৃহিণী ও মাতা হিসেবে শ্রীশ্রীমায়ের চিরন্তন রূপ। যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচরী এবং নবভারতের 'আনন্দমঠ' রামকৃষ্ণ মিশনের 'সঙ্ঘ-জননী' হয়েও এক রক্ষণশীল, গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে প্রাত্যহিক জীবনচর্যার প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি এক বৈপ্লবিক চিন্তাধারার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, যা সে-যুগের উচ্চ-শিক্ষিত, প্রগতিশীল পুরুষদের কাছেও চিন্তার অতীত ছিল।

তিনি ছিলেন জ্ঞান-প্রেম-করুণা-সরলতা- অসাধারণ বাস্তববোধ এবং উন্নত আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন এক ঊর্ধ্বস্তরের মানুষ। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন 'সারদা, সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।' তিনি বলেছেন—'ও আমার শক্তি।' আবার বলেছেন— 'যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এ শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন, আর

তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন।' ভক্তের দৃষ্টিতে তিনি দুর্গা, জগদম্বা, কালী, সরস্বতী এবং 'মা'-রূপে প্রতিভাত।

স্বামীজির কাছে তিনি ছিলেন 'জ্যান্ত দুর্গা'। মায়ের প্রতি স্বামীজির ভক্তি ছিল সীমাহীন। স্বামীজি একবার স্বামী যোগানন্দের কাছে আবেগভরে বলেন যে, "আমাদের মাতাঠাকুরানী বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির ভাণ্ডার, যদিও আপাতভাবে গভীর সমুদ্রের মতো শান্ত। তাঁর আবির্ভাব ভারতবর্ষের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করেছে। যে-আদর্শকে (তিনি) জীবনে উপলব্ধি করেছেন, যার প্রকাশ তিনি করেছেন তা কেবল ভারতীয় নারীদেরই মুক্তি দেবে না, পরন্তু সমস্ত পৃথিবীর নারীদের মন ও হৃদয়ে প্রবেশ করে তাদের প্রভাবিত করবে।"[১]

মাতৃদর্শনে যাওয়া স্বামীজির কাছে ছিল তীর্থযাত্রার সামিল। এজন্য বহু আগে থেকেই তিনি প্রস্তুতি নিতেন। পবিত্রতাস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যাবার আগে স্বামীজি বারংবার গঙ্গাজলে আচমন করতেন এবং নিজ দেহে গঙ্গাবারি সিঞ্চন করে নিজেকে পবিত্র করার চেষ্টা করতেন। স্বামী প্রেমানন্দ বলছেন যে, একবার স্বামীজি মাতৃদর্শনে যাবেন। স্বামীজি ভোরে উঠে গঙ্গা-স্নানে গেলেন এবং পরপর ডুব দিতে লাগলেন, যেন পবিত্রতা আর আনতে পারছেন না। শেষে যদিও-বা গঙ্গা থেকে উঠলেন, সেবককে বলতে লাগলেন—"ওরে আমার গায়ে গঙ্গাজলের ছিটে দে, গঙ্গাজলের ছিটে দে।" তারপর কোনক্রমে মায়ের দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে আর চলতে পারলেন না— ভাবে বিহ্বল হয়ে পড়ে গেলেন। মা এসে স্বামীজিকে তাড়াতাড়ি তুলে ধরলেন।

আরেকদিন। স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে মঠ থেকে নৌকা করে স্বামীজি মাতৃদর্শনে চলেছেন। স্বামীজি বারবার গঙ্গার ঘোলা জল খাচ্ছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজিকে বললেন যে, কেন তিনি বারবার ঘোলাজল খাচ্ছেন—এতে তো সর্দি-কাশি হবে। স্বামীজি উত্তর দিলেন— "না ভাই ভয় করে। আমাদের তো মন—মার কাছে যাচ্ছি, ভয় করে।" পূজার আসনে বসার আগে সাধক দেহ-মন শুদ্ধ করে। এও ঠিক তাই। মাতৃদর্শন স্বামীজির কাছে তীর্থ-পরিক্রমা।

শ্রীমায়ের চরণে প্রণাম—সেখানেও স্বামীজির অভিনবত্ব। স্বামীজি মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেন, মায়ের পাদস্পর্শ করতেন না এবং অন্যদেরও এভাবে প্রণাম করতে বলতেন।

এই নির্দেশ কেন? স্বামীজি বলতেন—"উনি এতই কৃপাময়ী, কোমলপ্রাণা, স্নেহাতুরা যে, কেউ ওঁর পাদস্পর্শ করলে উনি তৎক্ষণাৎ তাঁর জ্বালা-যন্ত্রণাকে টেনে নেবেন নিজের মধ্যে। তার ফলে অপরের জন্য ওঁকে নিঃশব্দে ভুগতে হয়।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মায়ের কাছে বেশি যেতেন না। স্বামীজির নির্দেশে তিনি মাকে প্রণাম করতে গেলেন এবং কোনোক্রমে টিপ করে প্রণাম করে উঠতেই পেছন থেকে স্বামীজির গম্ভীর কণ্ঠস্বর—"মাকে এইভাবে প্রণাম করতে হয়? সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম কর। মা যে

সাক্ষাৎ জগদম্বা।" স্বামীজি মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ লিখেছেন— "শ্রীমাকে কিভাবে প্রণাম করতে হয় স্বামীজিই তা আমাকে শিখিয়েছিলেন। বুঝিয়ে ছিলেন মায়ের স্বরূপ কি তাও।"[২] এই 'জ্যান্ত-দুর্গা'-কে কেন্দ্র করে তাঁর প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় স্বামী বিবেকানন্দের মতো তেজোদীপ্ত ও ঝঞ্ঝাসম সন্ন্যাসী মেতেছিলেন মানবহিতৈষণা ও মানবমুক্তির মহত্তর ব্রতে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মায়ের সান্নিধ্যে এসে ভাবে কাঁপতেন। স্বামী নির্বাণানন্দ লিখেছেন— "কাশীতে, বাগবাজারে এবং বেলুড় মঠে মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করছেন—এই দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য আমার বহুবার হয়েছে। দেখতাম মহারাজ মায়ের সামনে গেলে কেমন যেন হয়ে যেতেন—ভাবে বিহ্বল। স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারতেন না, পা টলত, শরীর থরথর করে কাঁপত। কোনোরকমে প্রণাম করেই উঠে আসতেন। অনেক সময় কাশীতে এবং মায়ের বাড়িতে প্রণাম করার জন্য ওপরে উঠতেই পারতেন না। নীচে থেকেই দাঁড়িয়ে যুক্তকর মাথায় তুলে মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতেন। বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ প্রমুখকেও মাকে প্রণাম করতে দেখেছি। তাঁদেরও প্রায় ওইরকমই অবস্থা। তবে অতটা নয়।"

স্বামী প্রেমেশানন্দ লিখছেন যে, স্বামী ব্রহ্মানন্দ "মাকে প্রণাম করতে গিয়ে তাঁর কাছে বেশিক্ষণ থাকতে পারতেন না— তিনি কাঁপতে কাঁপতে কোনরকমে প্রণাম করেই আবার কাঁপতে কাঁপতে চলে আসতেন। মহারাজ বোধহয় দেখতে পেতেন যে, মা all-inclusive, মায়ের উদরেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তাই বোধহয় তাঁর অমন হতো, আমরা তো এসব কিছুই বুঝতে পারতনাম না।"

স্বামী বিজয়ানন্দ (পশুপতি মহারাজ) মাতা-পুত্রের অপার্থিব সম্পর্কের একটি বিবরণ দিয়েছেন। তিনি একই সঙ্গে একদিনে শ্রীমা ও স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দর্শন করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভুবনেশ্বর যাবেন। পশুপতি মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দর্শন করার জন্য হাওড়া স্টেশনে নির্দিষ্ট প্লাটফর্মে অপেক্ষা করছেন। নির্দিষ্ট সময়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এলেন, কিন্তু তিনি "প্ল্যাটফর্মে ঢুকে তাঁর ট্রেনে না উঠে পাশের প্ল্যাটফর্মে যে-ট্রেনটি দাঁড়িয়েছিল সেইদিকে হাতজোড় করে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। দেখলাম, মহারাজ একটি কামরার সামনে গিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর সোজা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। প্ল্যাটফর্মের ওপরে ধুলো-ময়লা কত কি নোংরা পড়ে আছে আর কত লোক যাওয়া-আসা করছে! কিন্তু মহারাজ কোন কিছুতে ভ্রূক্ষেপ না করে ঐভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে ঐ কামরাটিতে উঠে একজন মহিলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। শুনলাম, তিনিই শ্রীশ্রীমা। তিনি যাচ্ছেন জয়রামবাটি। তাঁর গাড়ি ও মহারাজের গাড়ি প্রায় একই সময়ে। শ্রীশ্রীমাকেও আমার সেই প্রথম দর্শন।... মায়ের গাড়ি ছাড়ার সময় হল। মহারাজকে দেখলাম কেমন ভাবস্থ হয়ে হাতজোড় করে মায়ের সামনে থেকে পিছনে হেঁটে ধীরে ধীরে কামরা থেকে নেমে গেলেন। প্ল্যাটফর্মের ওপর মায়ের উদ্দেশ্যে আবার আগের মতো সাষ্টাঙ্গে প্রণাম

করলেন। তারপর উঠে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে রইলেন যতক্ষণ না মায়ের গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেল।"[৯] স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে মা ছিলেন 'সাক্ষাৎ জগদম্বা, নরদেহে স্বয়ং ভগবতী।'

স্বামী শিবানন্দের মতে, মা "সাধারণ মানবী নন, সাধিকাও নন বা সিদ্ধাও নন। সেই নিত্য-সিদ্ধা, সেই আদ্যাশক্তির এক প্রকাশ; যেমন কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ইত্যাদি, তেমনি।" স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছে "মা হলেন স্বয়ং অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী।" স্বামী অভেদানন্দের দৃষ্টিতে মা ছিলেন "সরস্বতী, জ্ঞানদায়িনী, আবার মুক্তিদাত্রী, মহামায়া।"

স্বামী প্রেমানন্দ মায়ের স্বরূপ বর্ণনা করে এক ভক্তকে বলছেন "তোমরা তো দেখে এলে, রাজরাজেশ্বরী সাধ করে কাঙালিনি সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন মাজছেন, চাল ঝাড়ছেন, এমনকি ভক্ত ছেলেদের এঁটো পর্যন্ত পরিষ্কার করছেন। জয়রামবাটীতে থেকে অত করছেন গৃহীদের গার্হস্থ্য ধর্ম শেখাবার জন্য। অসীম ধৈর্য, অপরিসীম করুণা, সর্বোপরি অভিমানরাহিত্য। .....বিশ্বাস করো, চাই না-ই করো; শ্রীশ্রীমা মানুষদেহধারিণী হলেও, তাঁর অপ্রাকৃত ভাগবতী তনু। জীবের কল্যাণের জন্য মনুষ্যবৎ লীলা করছেন। .....শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে, কে বুঝতে পারে? তোমরা সীতা, সাবিত্রী, বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীমতী রাধারানি—এঁদের কথা শুনেছ। মা যে এঁদের চেয়ে কত উঁচুতে উঠে বসে আছেন। ঐশ্বর্যের লেশ নেই.....মার বিদ্যার ঐশ্বর্য লুপ্ত। এ কী মহাশক্তি! জয় মা! জয় মা! শক্তিময়ী মা! দেখছ না, কত লোক ছুটে আসছে— যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি না—সব মায়ের নিকট চালান দিচ্ছি—মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন, অনন্ত শক্তি!"[১০]

কেবলমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-সন্তানরাই নন— মায়ের নিজ আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিতরাও তাঁকে এই দৃষ্টিতেই দেখতেন। মায়ের গর্ভধারিণী শ্যামাসুন্দরীর কাছে তিনি ছিলেন 'বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী'। মায়ের সেজভাই কালীকুমারের মতে—'দিদি আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।' শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র শিবুদাদার কাছে মা হলেন 'সাক্ষাৎ কালী', 'সাক্ষাৎ কপালমোচন'।

এ তো গেল, শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-সন্তান, মায়ের ভক্ত ও আত্মীয়দের কথা। তাঁদের পক্ষে আবেগপ্রবণ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু মায়ের পাশ্চাত্য-ভক্তদের কণ্ঠেও তো প্রায় একই সুর!

বিদেশিনি ভগিনী নিবেদিতার মতে—"আমার কাছে সব সময় মনে হয়েছে, তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী। কিন্তু তিনি কি একটি পুরোনো আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, না নতুন কোন আদর্শের অগ্রদূত? তাঁর মধ্যে আমরা খুঁজে পাব সেই জ্ঞান ও মাধুর্য, যা সাধারণতম নারীরও অনায়াসলভ্য। কিন্তু, আমার কাছে তাঁর শিষ্টতার অপরূপত্ব ও তাঁর বিরাট, খোলা হৃদয়, দেবীত্বের মতোই বিস্ময়কর মনে হয়েছে। যত নতুন বা জটিল কোনো প্রশ্ন হোক না কেন, আমি তাঁকে উদার এবং সহৃদয়–মীমাংসা দিতে ইতস্তত করতে দেখিনি। তাঁর সমস্ত জীবনটাই হচ্ছে একটা

একটানা নীরব প্রার্থনার মতো। তাঁর জীবনের সব অভিজ্ঞতাই হচ্ছে ঐশ্বরিক রাজ্য নিয়ে, দিব্য সমাজ নিয়ে। তবুও তিনি লৌকিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে সমর্থ।"[৬]

শ্রীশ্রীমায়ের ইহলীলা সংবরণের পর শ্রীমতী জোসেফাইন ম্যাকলাউড স্বামী সারদানন্দকে এক পত্রে লেখেন—"সেই নির্ভীক, শান্ত, তেজস্বী জীবনের দীপটি তাহলে নির্বাপিত হল, আধুনিক হিন্দু নারীর কাছে রেখে গেল আগামী তিন হাজার বছরে নারীকে যে মহিমময় অবস্থায় উন্নীত হতে হবে, তারই আদর্শ! আমার কাছে তাঁর জীবন হল অসীম উৎসাহের জীবন, যা আমাদের সবাইকে সেই শরণদায়ী, সহানুভূতিভরা জীবনতলে একত্র করেছে, যা নতুন প্রয়োজনের অনুরূপ আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ, ঋজুপ্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠিত নতুন নতুন আদর্শের নজির সৃষ্টি করেছে! ওঃ, তাঁর জীবন অবলম্বনে আমরা প্রত্যেকেই কী দৃষ্টান্তই না দেখাতে পারি! তিনি আদর্শের নতুন নতুন নজির সৃষ্টি করে গেছেন—আমাদেরও অবশ্য তাই-ই করতে হবে— তাঁর নয়, আমাদের স্বকীয় (জীবনের নজির সৃষ্টি)! আর অন্য কোনো উপায়ে, জগতের সমস্যাগুলির সমাধান করা যাবে না।[৭]

একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে, শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও চরিত্রে প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শ ও আধুনিকতার এক সুষম সমন্বয় ঘটেছিল—সমসাময়িক সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ছিলেন মূর্তিময়ী বিপ্লব, নারী জাগরণের অন্যতম পুরোধা, ভারতীয় নবজাগরণের জাগ্রত প্রতিমূর্তি এবং ভারতীয় নারীর কাছে এক জীবন্ত আদর্শ। বলা বাহুল্য, এ সবই তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পতি ও গুরু, দক্ষিণেশ্বরের সেই 'অশিক্ষিত', 'অর্ধোন্মাদ', 'বাচাল' ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের কাছ থেকে!

গ্রন্থ-নির্দেশিকা

১. চিরন্তনী সারদা, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, ১৯৯৭, পৃ. ২০৮-এ উদ্ধৃত।

২. ঐ, পৃ. ২১৮।

৩. স্বামী নির্বাণানন্দ, শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদনা—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, ২০০৩। পৃ. ৫০১-৫০২।

৪. শ্রীশ্রীমা ও সপ্তসাধিকা, স্বামী তেজসানন্দ, ১৯৭৭, পৃ. ২৩।

৫. চিরন্তনী সারদা, পৃ. ২৩৪-৩৫।

৬. যুগজননী সারদা, সম্পাদক ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, উদ্বোধন, ১৯৯৭, পৃ. ১৪-১৫

৭. উদ্বোধন, ১৩৭৬, শ্রাবণ, পৃ. ৩৪৪।